ভূমিকা

ভূমিকা

(১)

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে বুঝে নেওয়া দরকার যে আন্দোলন কী, সাহিত্য-আন্দোলনই বা কী; কীভাবে কোন প্রেক্ষাপটে শুরু হয় এক একটি সাহিত্য-আন্দোলন। 'আন্দোলন' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Movement'। এই আন্দোলন বা 'Movement' সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি যে কোনো পরিসরেই সংগঠিত হতে পারে। যুগে-যুগে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে বারবার আন্দোলিত হয় সমাজ; আর সমাজের দর্পণে অর্থাৎ সাহিত্যে তা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আমরা বাংলা সাহিত্যেও এমন বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতিফলন দেখেছি নানা কালে। সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলনের উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের বহু রচনা; এছাড়াও উনিশ শতকের মদ্যপান-বিরোধী বা বহুবিবাহ-বিরোধী বা কৌলীন্যপ্রথা-বিরোধী বিভিন্ন রচনা, কিংবা বিশ শতকেও বেগম রোকেয়াসহ অন্যান্য নারীমুক্তি-প্রয়াসীদের রচনা ইত্যাদি। আবার মধ্যযুগেই আমরা বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলাম চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে। আর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলনও আমরা মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে পেয়ে এসেছি; তুর্কি আক্রমণ থেকে শুরু করে এই গত শতকের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন কিংবা হালের সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম – এসবেরই প্রতিফলন দেখেছি বাংলা সাহিত্যে। আবার কেবল দেশীয় আন্দোলনই নয়, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন পরিসরে সংঘটিত অন্দোলনও বাংলা সাহিত্যের আয়নায় কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে কম-বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এসবের ক্ষেত্রে 'সাহিত্য-আন্দোলন' পরিভাষাটি কখনই প্রযোজ্য নয়।

আন্দোলনের পরিসর যখন কেবলমাত্র সাহিত্যই; সামাজিক বা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ইত্যাদি কোনো কিছুই নয়; তখনই কেবল 'সাহিত্য-আন্দোলন' পরিভাষাটি প্রযোজ্য। 'সাহিত্য-আন্দোলন' হয় সাহিত্যেই, আর তখনই সাহিত্যধারায় আসে এক-একটি ছোট-বড় বাঁকবদল। 'Dictionary of Literary Terms & Literary Theory'–তে 'সাহিত্য-

আন্দোলন' পরিভাষাটিকে বোঝা হয়েছে এভাবে, "A term commonly applied to a trend or development in literature." (Cuddon, p.448)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি পাকাপোক্ত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার পরে, বড়সড় বাঁকবদলটি হয়েছিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির তরুণ লেখকদের হাত ধরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত অসংখ্য সাহিত্য-আন্দোলনের ঢেউ মতবাদরূপে এইসময়ে এদেশে পৌঁছে বাংলা সাহিত্যকে নব নব রূপ দিয়েছে। এরপর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-জগতে এমন কিছু যৌথ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যেগুলি কোনো বিদেশি সাহিত্য-আন্দোলনসঞ্জাত নয়; এদেশের সাহিত্য-ভূমিতেই যাদের উৎপত্তি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ছোটগল্পের যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার মূলে ছিল বিমল করের 'ছোটগল্প-নূতনরীতি' গল্প-আন্দোলন। এরপর একের পর এক হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, নিমসাহিত্য আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন, নতুননিয়ম আন্দোলন, ছাঁচ-ভেঙে-ফেল আন্দোলন, প্রকল্পনা আন্দোলন, নিওলিট আন্দোলন, থার্ড লিটারেচার আন্দোলন, সমন্বয়-ধর্মী গল্প-আন্দোলন, গাণিতিক গল্প-আন্দোলন, চাকর-সাহিত্য-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনগুলি ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-ভূমিতে এক একটি তরঙ্গ তুলেছিল। বাংলা সাহিত্য-জগতে প্রাতিষ্ঠানিকতার (Establishment) বিরুদ্ধে সচেতনভাবে ঘোষিত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই আন্দোলনগুলির প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যাখ্যানও প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে। মূলধারার সাহিত্য পাঠককে যে স্থিতাবস্থার মধ্যে আটকে রাখে এই সাহিত্য সেই স্থিতাবস্থাকেই ভাঙতে চেয়েছিল নানাভাবে। ইতিহাস রচিত হয় রূপান্তরের হাত ধরে; সাহিত্যের ইতিহাসও এভাবেই এগিয়ে চলে। অশোক চট্টোপাধ্যায় 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধে বলেছেন, "সর্বদেশে ও সর্বকালে সাহিত্য বা যে কোন শিল্পেরই ধর্ম হচ্ছে ক্রমাগত নতুন থেকে নতুনতর হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এক সময়ের সাহিত্যকৃতি, তা যতই উচ্চাঙ্গের বা স্বাদু ও জনপ্রিয় হোক না কেন, অব্যবহিত কালের কবি ও লেখকের পক্ষে তাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রচলিত সাহিত্যধারাকে অতিক্রম করে নতুনতর রীতি ও প্রকরণ সৃষ্টিই তার অভীষ্ট। এই নিয়মেই নতুন থেকে নতুনতর উচ্চারণ ও প্রয়োগে সাহিত্য ক্রমাগত নতুন নতুন বাঁকে ও বৈচিত্রে বহমান থাকে। পরিবর্তন ও বিবর্তনের নিয়মেই সাহিত্য যুগে যুগে নতুন হয়ে ওঠে।" ('পদ্যপত্র', পৃ.৩৭)।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই রূপান্তর দুই ভাবে হতে পারে; এক হতে পারে কোনো ব্যক্তি-লেখকের প্রয়াসে; আরেক হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখকগোষ্ঠীর প্রয়াসে। এই গোষ্ঠীগত প্রয়াসের ক্ষেত্রেই 'সাহিত্য-আন্দোলন' পরিভাষাটি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিলেখক নন, এক লেখকগোষ্ঠী থাকবে, মতাদর্শগত দিক থেকে তাঁদের অবস্থান একই অবতলে হবে, এবং সর্বোপরি সেই লেখকগোষ্ঠীর একটি ইস্তেহার বা মুখপত্র থাকবে। তাকেই আমরা 'সাহিত্য-আন্দোলন' বলে বুঝব। "বিশেষ আদর্শ ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে কোন নামাঙ্কিত ও ঘোষিত গোষ্ঠীবদ্ধ লেখকদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনই ইতিহাসে বিশেষ সাহিত্য আন্দোলনের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত" বলে উল্লেখ করেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়ও ('পদ্যপত্র', পৃ.৩৭)। তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন, "১৯৬২-র কোন এক সন্ধ্যায় কেশব সেন স্ট্রিটে অমৃত পত্রিকার কর্মী ও ষাটের কবি-লিখিয়েদের একান্ত সুহৃদ কমল চৌধুরীর বাড়ির ছাদে মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে একটা আলোচনা সভা হল। যতদূর মনে পড়ছে ঐ আড্ডায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন – পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সভায় স্থির হল – নিজেদের নতুন সাহিত্যরীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম দরকার নতুন পরিকল্পনায় নতুন পত্রিকা। এই পত্রিকার রূপরেখা – কী থাকবে, কী থাকবে না, কীভাবে প্রকাশিত হবে, আর্থিক বন্দোবস্ত, নাম, দাম সবই প্রাথমিক ভাবে স্থির হল। উপস্থিত সকলেই প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গৃহীত হল। পরে অবশ্য অনেক যোগ-বিয়োগ হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হল পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা নয়, বুলেটিন হবে। নাম হবে এই দশক।" ('পদ্যপত্র', পৃ.৪০-৪১)। 'এই দশক' বুলেটিন থেকেই পরবর্তীকালে শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত। অন্যদিকে হাংরি আন্দোলনের ভাববিশ্বটি মলয় রায়চৌধুরীর মস্তিষ্কপ্রসূত হলেও, এই আন্দোলনের বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল দেবী রায়ের সম্পাদনায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে; স্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ ছিল মলয় রায়চৌধুরীর নাম। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অনেকেই। অর্থাৎ যৌথবদ্ধ প্রয়াস যে কোনো সাহিত্য-আন্দোলনেরই আবশ্যিক একটি শর্ত। একক লেখনীতে মহৎ কিছু সৃষ্টি হতেই পারে, কিন্তু সাহিত্য-আন্দোলন সম্ভব নয়।

(২)

কোনো কিছুই হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনা, সবকিছুরই পেছনে একটা ধারাবাহিকতা থাকে। উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সূত্রপাত কোন প্রেক্ষাপটে, তা দেখে নেওয়া যাক এখানে। পাশ্চাত্যে

সাহিত্য ও চিত্রকলার পরস্পর সংশ্লিষ্টতায় ইম্প্রেসনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেসনিজম, কিউবিজম, ফবিজম, সুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেসনিজম, ফিউচারিজম, সিম্বলিজম, রিয়ালিজম, ডাডাইজম, আভাঁগার্দ, ইমেজিসম, প্রিমিটিভিজম, পোস্ট-মডার্নিজম, সাবঅলটার্ন, পোস্ট-কলোনিয়াল, ম্যাজিক-রিয়্যালিজম, ন্যাচারালিজম, নিওক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম ইত্যাদি আন্দোলন ও মতবাদ এসেছে, সাহিত্যে নতুন নতুন স্রোত ও ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে; কেউ কেউ দীর্ঘায়ু হয়েছে, কেউ বা স্বল্পায়ু। তারও পর এ্যান্টি-পোয়েট্রি এবং পোস্ট-মডার্ন পোয়েট্রি – এসবই সাহিত্য আন্দোলন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই বিবর্তনের ধারাটি খুব স্পষ্ট। প্রাচীন-মধ্য যুগের একান্ত দেবনির্ভর সাহিত্যের পর মধ্যযুগেই, অন্তত চৈতন্য-পরবর্তী সাহিত্যে, মানবিক ভাবের উন্মেষ ও গুরুত্বেই আধুনিকতার এক রকম সূচনা বলা যায়। ক্রমশ বৈষ্ণব-শাক্ত কবিতা, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ - এই এক একটি মাইল-ফলক পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্রম-পরিণতি ঘটেছে। অঘোষিত আদর্শ ও নতুনতর নির্মিতির সৃষ্টিশীলতায় এঁরা এক এক জনই এক একটি সাহিত্য আন্দোলনের সমগোত্রীয়। এরপর তৃতীয় দশকে কিছু তরুণ লেখক প্রায় আন্দোলনের ঢঙেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রচলিত (রাবীন্দ্রিক) সাহিত্যের বিরুদ্ধে নতুন সাহিত্য-ধারার প্রচলন করতে চাইলেন। বাস্তবতার ব্যাপক চর্চায় তাঁরা তখন ছড়িয়ে পড়লেন জেলেপাড়া থেকে কয়লাখনি, এমনকী নিষিদ্ধপল্লিতেও। কিন্তু সাহিত্য আন্দোলনের পূর্বোক্ত শর্তে – ঘোষিত নামাঙ্কিত কোনো আন্দোলন তাঁরাও করেননি। এই সময়ে প্রচলিত সাহিত্যের যে বিরোধিতা, তা একান্তই ব্যক্তি-লেখকের বিরোধিতা; এসব কখনো সাহিত্য-আন্দোলনের রূপ পায়নি। প্রকৃত সাহিত্য-আন্দোলন বলতে কিছুই হয়নি। এর জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হল ষাটের দশক পর্যন্ত।

অবশ্য পঞ্চাশের দশকেই তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল, বলা যায়। ছোটগল্পের যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার মূলে আমরা পাই বিমল করের 'ছোটগল্প-নূতনরীতি' গল্প-আন্দোলন। এখানে গল্পের ঘটনাপ্রাধান্যের পরিবর্তে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হল। কাহিনিসর্বস্ব, নির্দিষ্ট পরিণতিনির্ভর অন্ত্যচমকের পরিবর্তে এক অন্তর্মুখী বোধই প্রধান হয়ে উঠল ছোটগল্পে। গতানুগতিক ছোটগল্প থেকে সরে এসে বিমল কর ঘোষণা করলেন যে, ছোটগল্পকে ছোট ও গল্প হতে হবে – এমন চলতি ধারণার শরিক তাঁরা নন। 'ছোটগল্প নূতনরীতি'র পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচজন গল্পকারের পাঁচটি গল্প – জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্তমাংস', মিহিরকুমার গুপ্তের 'অনাম্য' এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা'। মাত্র পাঁচটি সংখ্যায় একটি করে মোট পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হলেও, এই গল্পগুলি নিয়ে হইচই কম হয়নি ১৯৫৮-৫৯-এ। গল্পের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ভিতটিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল

এই গল্পগুলি। কেবল পত্রিকাই নয়, 'নূতনরীতি'র গল্প নিয়ে ১৯৬০-এ বিমল কর 'এই দশকের গল্প' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনে স্থান পেয়েছিল দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প; পরবর্তীকালে যাঁদের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্প এক বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, "পাঁচের দশকেই নতুন এক গল্পধারার উৎসারণ সম্ভাবিত হয়ে উঠেছিল। সেই লেখকেরা – কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, কার্তিক লাহিড়ী; পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে অমিয়ভূষণ মজুমদার নিয়ে এলেন এক নতুন গল্প-কথন-শৈলী, সে সব গল্পও সমাজমনস্ক; সমাজবিধি ও মানব-মনস্তত্ত্বের সংঘাতেই তাঁদেরও জন্ম। কিন্তু বাস্তবের নির্মমতর, কঠোরতর এক রূপাবয়ব গড়ে তুললেন তাঁরা যেখানে মানুষের অন্তর্গূঢ় মনের আত্মদহনক্লিষ্ট, রক্তরেখাঙ্কিত মনোচিত্রণ ফুটে ওঠে। মধ্যবিত্তের চেনা গল্পছকের বাইরে, গল্পের ঘটনা-ভাগ সংবৃত করে মনের দ্বন্দ্ব আর নিরাশ্রয়তা ফুটিয়ে তুললেন তাঁরা।" ('শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ.৩৯৬)।

আবার কবিতার ক্ষেত্রেও দেখি, পঞ্চাশের শঙ্খ-সুনীল-শক্তি-অলোকরঞ্জন ত্রিশ বা চল্লিশের কবিদের থেকে কত আলাদা। 'শ্রুতি নিয়ে কিছু কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে মৃণাল বসুচৌধুরী বলেছেন, "কবিতা লিখতে যখন শুরু করি, তখন আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলা কবিতার দিকপালেরা। তিরিশের কবিরা তখন মধ্যগগনে। চল্লিশের নক্ষত্ররাও নিয়মিত লিখছেন আর পঞ্চাশের কবিরা প্রাণপণে বদলে দিতে চাইছেন পূর্বপ্রজন্মের কবিতার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি।" ('পদ্যপত্র', পৃ.১০৯)। এরপর ষাটের দশকেই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত সাহিত্য-আন্দোলনের সূচনা। 'শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে দেবেশ রায় বলেছেন, "কল্লোল – কালিকলম – বিচিত্রা থেকে আমাদের যে-সাহিত্য আন্দোলনগুলির শুরু সেগুলির কোনও উদ্দেশ্যপত্র বা ইতিহাস নেই। 'সবুজপত্র' পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যপত্র ও তা নিয়ে তর্কবিতর্ক সাহিত্যচর্চায় আবশ্যিক ছিল। যাকে 'কল্লোলযুগ' বলা হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সুলিখিত বইটির নাম ধার করে – তার না আছে, না ছিল, কোনও অন্তর্লীন জিজ্ঞাসা। আর, 'কল্লোলযুগ' বইটিতে অচিন্ত্যকুমার কাউকেই 'কল্লোল'-এর বাইরে রাখেননি, 'কল্লোল'-এর ব্যাপ্তি বোঝাতে। পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' যেমন পরবর্তী কালে এক ভৌতিক সর্বজনীনতার স্বেচ্ছানির্বাচিত আধুনিকতা হয়ে উঠেছিল। যেন, 'কৃত্তিবাস'-এর বাইরে কোনও আধুনিকতা ছিল না। 'ছোটগল্প : নূতনরীতি'ও তেমন স্পষ্ট ছিল না যদিও তার সর্বজনীনতার দাবিও ছিল না। শাস্ত্রবিরোধীরা সেখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন – কেন তাঁরা শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।" ('শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন',

পৃ.৩৪৭)। ষাটের তরুণ লেখকেরা সচেতনভাবে তাঁদের আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী তাত্ত্বিক ঘোষণার দ্বারা সাহিত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

এবারে আসা যাক দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে। সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সূত্রপাত যে দশকে, সেই ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গ বলতে প্রথমেই আমাদের যা মনে পড়ে তা হল তখনকার রাজনৈতিক অস্থিরতা। খণ্ডিত স্বাধীনতা যে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি, তার প্রমাণ হল স্বাধীনতা পরবর্তী এই দিনগুলি। ষাটের দশকের এই অস্থির ও ঘটনাবহুল দিনগুলিকে একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

পঞ্চাশের দশক শেষ হতে না হতেই চল্লিশের উত্তাল দিনগুলি আবার ফিরে এল যেন। ১৯৫৯-এ আমরা দেখি খাদ্য-সংকট; দুমুঠো ভাতের জন্য মানুষের হাহাকার। এরপর ষাটের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৬২-এর ভারত-চীন যুদ্ধ, যা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। এই যুদ্ধের প্রথম আক্রমণকারী নিয়ে দ্বিমতের আজও অবসান হয়নি। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি চিনকে আক্রমণকারী হিসেবে ঘোষণা করে জনসাধারণকে নেহেরুর পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানায়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ নেহেরু সরকারকেই আক্রমণকারী হিসেবে দায়ী করে, ফলে ১৯৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৬৫-এর ভারত-পাক যুদ্ধ, ১৯৬৬-এর আবার খাদ্য সংকট, এবং ১৯৬৭-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, সর্বোপরি বিগত কয়েক দশকের জমে থাকা ক্ষোভ উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭তে 'নকশাল' নামাঙ্কিত হয়ে যাওয়া – সব মিলিয়ে এক তুমুল অস্থিরতা। এই নকশাল আন্দোলন একভাবে তেলেঙ্গানা, তেভাগারই আরেক মহড়া বা উত্তরসূরি বলা যায়। আদতে কৃষক আন্দোলন হলেও, নকশাল আন্দোলনে শ্রমিক, ছাত্রসহ মধ্যবিত্ত মানুষের অংশগ্রহণে তা সামগ্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের চেহারা নেয়।

এই রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থিরতার সঙ্গে সেই সময়ের সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সম্পর্ক সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া যায় না হয়তো। তেইনের 'Race, milieu, moment' তত্ত্ব অনুসারে একজন লেখককে নির্মাণের পেছনে যেমন দেশ-কালের ভূমিকাকে স্বীকার করতেই হয়, ঠিক সেভাবেই এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলিকে দেশ-কালের চালচিত্রে রেখে বুঝে নিতে হবে; কেবলই সাহিত্যের প্রবহমান স্রোতের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে বুঝলেই হবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে কেন বিশেষ করে ষাটের দশক হয়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, প্রতিবাদ ও সম্পূর্ণ নতুন পথ খোঁজার দশক, তার উত্তর হয়তো খুঁজতে হবে রাজনীতির ইতিহাসে,

সমাজতত্ত্বে। 'শেখর বসুর শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে রবিন পাল বলেছেন, "সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলন নিয়ে রীতিমত হইচই ষাটের দশকে যেমন হত, তেমনটা পরে আর ছিল না। কারণ হয়তো হিংস্র বাস্তব আর রাজনীতি।" ('শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ.৩৮৬)। 'সীমাহীন নিঃসঙ্গতার শিল্পী সুনীল জানা' শীর্ষক প্রবন্ধে শৈলেন সরকার বলেছেন, "তাঁরা কি ঘোষণা না করলেও আসলে রাজনৈতিক নকশালদের মতোই বুর্জোয়া আর পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠিত 'লজিক' আর 'রিজনিং' এর বিরুদ্ধতা করার জন্য 'ইরাশনালিটি'-র রাস্তায় হাঁটতে চেয়েছিলেন?" ('শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ.৪৩০-৪৩১)। ভাবাদর্শগত দিক থেকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলনের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। নকশালরা যেমন শাসনযন্ত্রের প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটিকে ভাঙতে চেয়েছিলেন, এই সাহিত্য-আন্দোলনকারীরাও তেমন শিল্প বা সাহিত্যের প্রচলিত কাঠামোটিকে আক্রমণ করেছিলেন। কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ও বলেছেন, "দর্শনের দিক থেকে এই দুই আন্দোলনেরই প্রতিভাভূমি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। আর কর্মপ্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতোপ্রণোদনার ওপর নির্ভর করে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এনে দেয়া।" (ক্ষু.স. পৃ.১৭৬)। যদিও এই সাহিত্য আন্দোলনকারীরা ঘোষিতভাবেই সর্বপ্রকারের রাজনীতির থেকে দূরে ছিলেন, তবুও আজ মনে হয় তৎকালীন সমাজ-রাজনীতি সবকিছুর সঙ্গেই এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সুগভীর শিকড়ে ভাবগত বা আদর্শগত (Ideological) একটা মিল ছিলই।

(৩)

এবারে উক্ত আন্দোলনত্রয় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা যাক। বাংলা সাহিত্য-জগতে ষাট-সত্তরের দশকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলন সমকালে বহুচর্চিত, বহু-আলোচিত হলেও, এই আন্দোলনগুলি নিয়ে গবেষণামূলক কাজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। খুবই সাম্প্রতিককালের হাতে গোনা দু'একটি গবেষণা-মূলক গ্রন্থের কথা বাদ দিলে, এই ত্রিবিধ সাহিত্য-আন্দোলন নিয়ে যাঁরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত লেখকেরা। এপ্রসঙ্গে হাংরি আন্দোলন বিষয়ক দুটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রন্থদুটি হল –

- মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি কিংবদন্তী' (জুলাই, ১৯৯৪)
- শৈলেশ্বর ঘোষের 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন' (জানুয়ারি, ১৯৯৫)

এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ধরা পড়েছে হাংরি আন্দোলনের দুটি প্রতিস্পর্ধী ইতিহাস। মলয় রায়চৌধুরী সৃষ্ট মূল 'হাংরি' আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে শৈলেশ্বর ঘোষের 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় দফার হাংরি আন্দোলনের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক তা এই বইদুটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও তথ্য সহযোগে এই বইদুটি হাংরি আন্দোলনের ইতিহাসের দুটি আকর গ্রন্থস্বরূপ হয়ে উঠেছে। এছাড়া হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের সমকালে নিজেদের বা একে অপরের রচনা নিয়ে কিংবা আন্দোলন বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখেছেন নিজেদের পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তবে তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের স্বরচিত এই সাহিত্যধারাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তা মূলত মন্ময় বা 'Subjective'। সাম্প্রতিককালেও তাঁদের এই বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলির অধিকাংশই মূলত স্মৃতিচারণামূলক, তবে নিঃসন্দেহে তথ্যসমৃদ্ধ। ফলত, সাহিত্য-আন্দোলনগুলির ইতিহাস জানতে এই প্রবন্ধগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত না হয়েও যাঁরা সমকালে এই আন্দোলনগুলিকে দেখেছেন, এমন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির দু'টি গ্রন্থ এ'প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থদুটি হল –

- উত্তম দাশের 'হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' (জানুয়ারি, ১৯৮৬)
- সন্দীপ দত্তের 'বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক' (মে, ১৯৯৩)

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে জানতে হলে এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সমকালীন কবি উত্তম দাশের 'হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' শীর্ষক গ্রন্থটি অপরিহার্য। 'হাংরি জেনারেশন : একটি সমীক্ষা', 'শ্রুতি আন্দোলন', 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', 'ক্ষুধার্ত প্রজন্ম : বিদ্রোহ না সন্ন্যাস' শীর্ষক চারটি প্রবন্ধের সংকলন এটি। আন্দোলনত্রয়ের ইতিহাস, মুখপত্র সম্পর্কিত তথ্য ও তালিকা, আন্দোলনের মতাদর্শ আলোচনার পাশাপাশি এই সাহিত্য সম্পর্কেও আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কেবল মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্য নয়, আন্দোলনের সমকালে এই লেখকের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের পরিচয়ও আমরা পেয়ে যাই এখানে। হাংরিদের নিষিদ্ধ বুলেটিনের ছবি, চিঠিপত্র, আইনী নথি সহযোগে 'হাংরি জেনারেশন : একটি সমীক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি হাংরিদের ওপর 'প্রাতিষ্ঠানিক' আক্রমণের প্রমাণস্বরূপ দলিল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানতে হলে সন্দীপ দত্তের 'বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক' গ্রন্থটির কোনো জুড়ি নেই। ষাট-সত্তর-আশি এই তিন দশকের

সাহিত্য-আন্দোলনগুলিকে ‘কবিতা-আন্দোলন’ ও ‘গল্প আন্দোলন’ শীর্ষক দুটি পৃথক পর্বে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। কবিতা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে হাংরি, শ্রুতি, ধ্বংসকালীন, প্রকল্পনা, আজকাল, নিওলিট, থার্ড লিটারেচার, উত্তর-আধুনিক, এবং গল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী, নিম, গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী, ঘটনা প্রধান গদ্য, নতুন নিয়ম, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো, সমন্বয়-ধর্মী, গাণিতিক গল্প, থার্ড লিটারেচার আন্দোলনের মুখপত্র সম্পর্কিত তথ্য, আন্দোলন শুরুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আন্দোলনের মতাদর্শ তথা প্রকৃতি সবকিছুই জানা যায় এই গ্রন্থ থেকে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আন্দোলনগুলির ইস্তেহারগুলিকেও তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই ইস্তেহারগুলির অধিকাংশই আজ দুষ্প্রাপ্য। এছাড়া এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে কবিতা ও গল্প-আন্দোলনগুলির ধারায় রচিত সাহিত্যের কিছু নমুনাও তিনি তুলে ধরেছেন। ফলত এই বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে তিন দশকের সাহিত্য-আন্দোলন সংক্ষেপে অথচ সামগ্রিকভাবে ধরা পড়েছে বলা যায়। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সাহিত্য-আন্দোলনগুলি নিয়ে বা নির্বাচিত কোনো আন্দোলনকারীকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে, সেখানে প্রাবন্ধিকদের বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-আন্দোলনগুলিকে দেখা হয়েছে। এছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা সমালোচনামূলক সংকলনগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–

- ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত ‘বাংলা সাহিত্য আন্দোলন’ (জুন, ২০১৪)
- সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত ‘শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন’ (জানুয়ারি ২০১৮)

‘বাংলা সাহিত্য আন্দোলন’ গ্রন্থটি এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন। ষাট-সত্তর-আশির দশকের হাংরি, শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী, নিম, ধ্বংসকালীন, থার্ড লিটারেচার, পোস্টমডার্ন আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সাহিত্য-আন্দোলনগুলিও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল – শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী, নিম, ধ্বংসকালীন, থার্ড লিটারেচার ইত্যাদি বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন এই আন্দোলনগুলির অন্যতম প্রধান কাণ্ডারীরাই। ফলে তথ্যসমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিটিও জানা যায়। অন্যদিকে, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন’ গ্রন্থটি একদিকে যেমন শাস্ত্রবিরোধী গল্পের সংকলন, তেমনই এটি সমালোচনা-গ্রন্থও বটে। মূল আটজন শাস্ত্রবিরোধী

গল্পকারের গল্প স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। শেখর বসুর সংকলিত 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প' গ্রন্থে অবশ্য ত্রিশ জন গল্পকারের গল্প স্থান পেয়েছিল।

প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে বৃহত্তর পরিসরে এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলি নিয়ে গবেষণাকাজ খুবই কম। তবে এপ্রসঙ্গে গবেষক কুমার বিষ্ণু দে'র 'হাংরি আন্দোলন ও দ্রোহপুরুষ কথা' শীর্ষক গবেষণা-গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা-গ্রন্থটি মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা – ১। হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস, ২। আন্দোলন কথার নানাদিক এবং হাংরি আন্দোলন ভাবনা, ৩। হাংরি শরিক সমুজ্জ্বল এবং চিৎকার সংযোজন, ৪। হাংরি আন্দোলন ও দ্রোহপুরুষ কথা, ৫। মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন। এছাড়া আরও দুটি পর্ব সংযোজন করেছেন গবেষক, যথা – ৬। একগুচ্ছ হাংরি কবিতা, ৭। দুষ্প্রাপ্য তথ্য ও ছবি। মোট সাত পর্বের এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে মলয় রায়চৌধুরী সৃষ্ট মূল হাংরি আন্দোলনের সাতকাণ্ড রামায়ণ।

প্রথম অধ্যায়ে কুমার বিষ্ণু দে যেভাবে হাংরি আন্দোলনের ইতিহাসকে তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। বেশকিছু হাংরি বুলেটিন অবিকৃতভাবে তুলে ধরে তিনি হাংরিদের মতাদর্শগত অবস্থানটিকে আলোচনা করেছেন। এছাড়া সেই সময়ে প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করতে গিয়ে হাংরিরা সাহিত্যরচনার পাশাপাশি আরও যেসব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাও তথ্যসমৃদ্ধভাবে তুলে ধরেছেন গবেষক। হাংরি লেখকদের তালিকাও পাঠক পেয়ে যাবেন এই অধ্যায়েই। এমনকী যারা হাংরি বুলেটিনে না লিখলেও হাংরি মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদেরও উল্লেখ করেছেন গবেষক। আবার কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে হাংরি আন্দোলনের প্রভাব, বিদেশে হাংরি সাহিত্যের প্রকাশ ও আলোচনা ইত্যাদি বিবিধ দিকে আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়েই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষক সাহিত্য-আন্দোলনের সংজ্ঞা নির্মাণের পাশাপাশি হাংরি আন্দোলনের প্রাথমিক পরিচিতি ও ভাববিশ্বটিকে তুলে ধরেছেন। হাংরি আন্দোলন নিয়ে বিভিন্নজনের আলোচনার একটি তালিকাও তুলে ধরেছেন। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলনকৃত পালাবদলের অভিমুখটি নির্দেশ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের লেখা নিয়ে আলোচনা। কবিদের মধ্যে রয়েছেন – শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, উৎপলকুমার বসু, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবো আচার্য, ফাল্গুনী রায়, আলো মিত্র, ত্রিদিব

মিত্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে পৃথক পরিসরে আলোচনা করায় এই অধ্যায়ে তা আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন গবেষক। উক্ত নামগুলি থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এঁরা প্রত্যেকে সমান 'হাংরি' নন; হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, বা যাঁরা সরাসরি যুক্ত না থাকলেও মতাদর্শগত নৈকট্যে যাঁদের কিছু লেখা ছাপা হয়েছে হাংরি বুলেটিনে, বা যাঁরা নির্দিষ্ট কোনো সময়পর্বে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে ছিলেন না – কেউই বাদ যাননি এই আলোচনায়। এছাড়া এই আলোচনায় স্থান পেয়েছেন চিত্রকর করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, অনিল করঞ্জাই এবং তিনজন হাংরি গদ্যকার সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ। তবে হাংরি আন্দোলন মূলত কবিতা-আন্দোলন, সম্ভবত সেকথা মাথায় রেখেই গবেষক এই গবেষণা-গ্রন্থটিতে সামগ্রিকভাবে মূলত কবিতার ওপরেই জোর দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়টিকে বলা যেতে পারে পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ের গৌরচন্দ্রিকা। পঞ্চম অধ্যায়ে মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা বিশ্লেষণের আগে চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষক বুঝে নিতে চেয়েছেন তাঁর মননবিশ্বকে। এই চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে মলয় রায়চৌধুরীকে 'দ্রোহপুরুষ' আখ্যা দেওয়ার কারণগুলি নির্দেশ করেছেন গবেষক। এরপর তাঁকে নিয়ে বিদ্বদজনদের মতামতকে তুলে ধরে, তাঁর কবি-স্বাতন্ত্র্য, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর চিন্তাজগৎটি আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা নিয়ে আলোচনা। কেবল আন্দোলনের সমকালের কবিতা নয়, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রকাশিত মলয় রায়চৌধুরীর যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন গবেষক। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে খুব স্পষ্ট যে, কবি মলয় ষাটের দশকে যতটা 'হাংরি' ছিলেন, আজও ঠিক ততটাই। যেন আজও তিনি তাঁর কবিতায় হাংরি আন্দোলন জারি রেখেছেন – সত্যই তিনি দ্রোহপুরুষ।

এরপর গবেষক 'একগুচ্ছ হাংরি কবিতা' শীর্ষক পর্বে নয়জন হাংরি কবির একটি করে কবিতা সংযোজন করেছেন। হাংরিদের ভাববিশ্বটিকে ফুটিয়ে তোলে এমন শীর্ষস্থানীয় কবিতাগুলিকে নির্বাচন করেছেন গবেষক। এরপর এই গ্রন্থের শেষ পর্বটিতে হাংরি আন্দোলনকারীদের ছবি, দুষ্প্রাপ্য কিছু হাংরি বুলেটিনের ছবি, হাংরিদের গ্রন্থের প্রচ্ছদের ছবি, শৈলেশ্বর ঘোষের দ্বিতীয় দফা হাংরি আন্দোলনের মুখপত্র 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার কয়েকটি

সংখ্যার প্রচ্ছদের ছবিসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন গবেষক। এতসব তথ্যের সমাবেশে গবেষক কুমার বিষ্ণু দে'র এই সুলিখিত গ্রন্থটি একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থের রূপ নিয়েছে। তাই হাংরি আন্দোলনকে বোঝার ক্ষেত্রে, 'দ্রোহপুরুষ' মলয় রায়চৌধুরীকে বোঝার ক্ষেত্রে 'হাংরি আন্দোলন ও দ্রোহপুরুষ কথা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

হাংরি আন্দোলন নিয়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাকাজ করেছেন উদয় শংকর বর্মা; ২০০৬ সালে তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : ইতিহাস ও সাহিত্য বিচার' শীর্ষক গবেষণাকাজটি সম্পূর্ণ করেন। তিনি সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিকে দুটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্বটি হল 'ইতিহাস পর্ব', যেখানে তিনি ছয়টি অধ্যায়ে যথাক্রমে আলোচনা করেছেন –

- 'সাহিত্যে আন্দোলন অভিধাটির তাৎপর্য নির্ণয়'
- 'বাংলা ভাষায় সাহিত্য আন্দোলনের পূর্বসূত্র'
- 'হাংরি জেনারেশন অভিধাটির উৎপত্তি, আন্দোলনের প্রস্তুতি ও তত্ত্ব নির্মাণ পর্ব'
- 'আন্দোলনের বিস্তার পর্ব'
- আন্দোলনের পরিণতি পর্ব
- আন্দোলনের উত্তর প্রভাব

দ্বিতীয় পর্বটি হল 'সাহিত্য বিচার পর্ব', যেখানে হাংরি সাহিত্যকে বিচারের ক্ষেত্রে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত মন্ময় বা 'Subjective'। এই পর্বে গবেষক চারটি অধ্যায়ে যথাক্রমে আলোচনা করেছেন –

- 'কবি ও কবিতা'
- 'কথাসাহিত্য'
- 'নাট্যকৃতি'
- 'সার্বিক মূল্যায়ন ও উত্তরকালের উপর প্রভাব'

প্রথম অধ্যায়ে গবেষক হাংরি কবিদের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়, সুবো আচার্য, দেবী রায়, সমীর রায়চৌধুরী, উৎপল কুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র ও রবিউল হুসাইন-এর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় রয়েছেন হাংরি গদ্যকার বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ ও সুবিমল বসাক। তৃতীয় অধ্যায়ে মলয় রায়চৌধুরী ও ফাল্গুনী রায়ের নাট্যকৃতি আলোচনা করেছেন

গবেষক। সবশেষে চতুর্থ অধ্যায়ে হাংরি আন্দোলনের সার্বিক মূল্যায়ন এবং উত্তরকালের ওপর এই আন্দোলনের প্রভাব অন্বেষণ করেছেন গবেষক। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে বেশ কিছু নথিপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত গবেষণাকাজ দু'টির মধ্যে বিষয়গত নৈকট্য খুবই বেশি হলেও, গবেষকদ্বয় নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস ও সাহিত্যকে বিচার করেছেন। অবশ্য গবেষক কুমার বিষ্ণু দে'র কাজটিতে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে উভয় গবেষণাকর্মেই গবেষকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত 'Impressionistic'। এছাড়া সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুজনকে (যেমন, শেখর বসু, রমানাথ রায়) নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গবেষণাকর্ম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বলে জানা গেলেও, ষাট-সত্তর-আশির দশকের অন্যতম প্রধান তিনটি সাহিত্য-আন্দোলন হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে সামগ্রিক গবেষণাকাজ তেমন চোখে পড়ে না। তাই শৈলীবিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উক্ত তিনটি আন্দোলনসঞ্জাত সাহিত্যের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয় করাই বর্তমান গবেষকের অন্বিষ্ট।

(৪)

এবারে আসা যাক গবেষণা পদ্ধতির কথায়। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাত্ত্বিক (Theoritical) বা মৌলিক (Fundamental) এই গবেষণাকর্মটিতে শৈলীবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যকে দেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত অনুভূতির নিরিখে সাহিত্য বিচার তথা মন্ময় (Subjective) অনুসন্ধান থেকে সরে এসে তন্ময় (Objective) ও বস্তুনিষ্ঠ পাঠই শৈলীবিজ্ঞানে করা হয়ে থাকে। 'A Glossary of Literary Terms'-এ তাই বলা হয়েছে, "Since the 1950s the term 'stylistics' has been applied to critical procedures which undertake to replace what is claimed to be the subjectivity and impressionism of standard analyses with an 'objective' or 'scientific' analysis of the style of literary texts." (Abrams & Harpham, p.385) প্রথাগত পদ্ধতি মূলত নন্দনতাত্ত্বিক (aesthetic) বিশ্লেষণেরই একটি দিক, যেখানে ভাবা হয় সাহিত্য অখণ্ড ও সমগ্র (organic whole), সাহিত্যের আধার (form) ও আধেয় (content) অবিচ্ছিন্ন। এধরণের সাহিত্য-সমালোচনা সমালোচকের নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত (impressionistic)। অন্যদিকে শৈলী বিশ্লেষণের

মাধ্যমে সমালোচনা পদ্ধতি হয়ে ওঠে ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যুক্তিনিষ্ঠ, বিধিবদ্ধ ও প্রমাণযোগ্য। তাই শৈলীবিজ্ঞান অন্যান্য সমালোচনা পদ্ধতির পরিপূরক একটি পদ্ধতি। বর্তমান গবেষণায় প্রথাগত সমালোচনা পদ্ধতির পরিবর্তে শৈলীবিজ্ঞানের বিধিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। 'Dictionary of Literary Terms and Literary Theory' গ্রন্থে 'Stylistics'কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "it is an analytical science which covers all the expressive aspects of language : phonology, prosody, morphology, syntax and lexicology." (Cuddon, p.688) বর্তমান গবেষণায় ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological), রূপতাত্ত্বিক (Morphological), শাব্দিক (Lexical), আন্বয়িক (Syntactic) ও শব্দার্থতাত্ত্বিক (Semantical) দিকের পাশাপাশি লেখরীতিগত (Graphological) শৈলীর দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণার আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) অবলম্বনে ত্রিবিধ সাহিত্যের শৈলী-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈলীগত প্রকৌশলগুলিকে (Stylistics tools) চিহ্নিত করার পাশাপাশি, সেগুলি কীভাবে একটি 'discourse'কে নির্মাণ করছে এবং তা কীভাবে ও কতটা লেখকের চিন্তন বা ভাববিশ্বকে প্রতিফলিত করছে, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বর্তমান গবেষকের অন্বিষ্ট।

সবশেষে আসা যাক এই গবেষণাকর্মের তথ্য-সংগ্রহের (Data Collection) কথায়। হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের মূলরচনা ধরে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এই আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্ররূপ পত্রিকার মূল সংখ্যাগুলিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত কেবল কবিতা ও গল্পই নয়, বুলেটিন ও পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত এই আন্দোলনের ইস্তেহার, নানা প্রবন্ধ, তৎকালীন পাঠকের মতামত, আন্দোলনকারীদের প্রত্যুত্তর, তাঁদের গ্রন্থ-সমালোচনা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আন্দোলনত্রয় ছাড়াও সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলনের ইস্তেহার, বুলেটিন, মুখপত্র ইত্যাদি এই গবেষণাকর্মের সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র' থেকেই হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। শ্রুতি পত্রিকার যে কয়েকটি সংখ্যা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়নি, সেই সংখ্যাগুলি শ্রুতিকবি পরেশ মণ্ডলের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া সাহিত্য-আন্দোলন সংক্রান্ত বেশ কিছু বইপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী শেখর

বসু, শ্রুতি আন্দোলনের পুরোধা-কবিদ্বয় মৃণাল বসুচৌধুরী ও পরেশ মণ্ডলের কাছ থেকে। ‘লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র’ এবং সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য বেশকিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বেশকিছু বই সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্য সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য-উপাদানগুলিকে আকর (Primary) ও সহায়ক (Secondary) উৎসভেদে এবং বিষয় ভেদে সুবিন্যস্ত (Data Arrangement) করে ‘Qualitative method’-এ তা বিশ্লেষণ (Data Analysis) ও পুনর্মূল্যায়ন (Data Reassessment) করা হয়েছে। এছাড়া সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের নেতৃত্ব-স্থানীয় তিনজন লেখক (হাংরির মলয় রায়চৌধুরী, শ্রুতির মৃণাল বসুচৌধুরী, শাস্ত্রবিরোধীর শেখর বসু) এবং তাঁদের সমসাময়িক একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের (লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের পুরোধা সন্দীপ দত্ত) সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বহু তথ্য, ইতিহাস, স্মৃতিচারণা, আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি জানা গিয়েছে। এই মৌখিক তথ্য-উপাদান (Oral Data) সংগ্রহের ক্ষেত্রে ‘Paper Questionnaire Method’ অনুসরণ করা হয়েছে, যা পরিশিষ্ট অংশে সংযোজন করা হয়েছে।